সামারা তিন্নি
কৃষ্ণ কুমার গুপ্ত
হাফিজুর রহমান রিক

কফি শপ

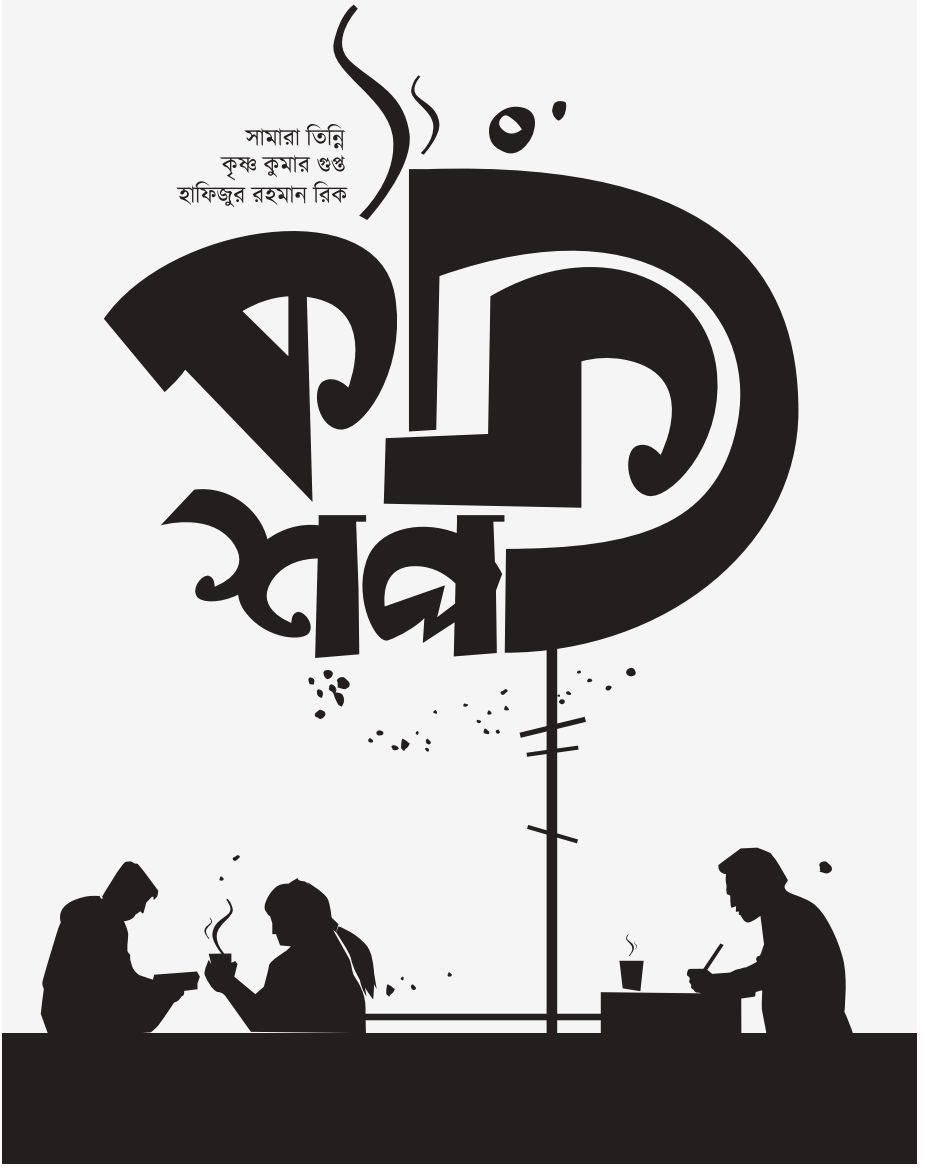

গল্প শুরুর গল্প

প্রথমেই পাঠকদের একটি কথা জানিয়ে দিতে চাই, এটা কিন্তু আমাদের তিনজনের লেখা ছোটগল্পের সংকলন নয়। কফিশপ আমাদের তিনজনের একত্রে লেখা একটি উপন্যাস। যৌথ গল্প বা উপন্যাস লেখাটা কষ্টসাধ্য কাজ। কারণ যারা লেখালেখি করেন তাদের সবারই আছে লেখার নিজস্ব ধরণ। একজনের ধরণ আরেকজনের শতভাগ পছন্দ হওয়ানোর চাইতে ডুমুরের ফুল খুঁজে পাওয়াটা সহজ। কিন্তু তারপরেও এই জটিল কাজটা আমরা ভীষণ মজা আর আনন্দ নিয়ে করেছি।

লেখাটি শেষ হবার পর আমরা তিনজনেই আবিষ্কার করলাম যে আমাদের মন খারাপ। শুধু খারাপ না ভয়াবহ খারাপ। জগতের নিয়মের বাইরে কে যেতে পারে? অতএব কফিশপের ইতি টানতে হয়েছিল। তবে এর বিনিময়ে আমরা পেয়েছিলাম পাঠকদের অগণিত ভালোবাসা। ব্লগে পোস্ট করার পরে লেখাটি দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল আর এত পাঠক লেখাটিকে ছাপার অক্ষরে দেখতে চাইলেন যে আমাদের তিনজনেরই মনে হতে লাগল বইটি শেলফে থাকা দরকার। সুতরাং তিনজনে তিনটি ভিন্ন দেশে—বাংলাদেশ, ফ্রান্স এবং অস্ট্রেলিয়াতে অবস্থান করা সত্ত্বেও আবার কাজে হাত লাগালাম লেখাটিকে পরিবর্ধিত করতে। কাপের পর কাপ চা ফুরিয়ে যেতে লাগল আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল কফিশপ প্রজেক্ট নিয়ে করা গ্রুপের নোটিফিকেশন। কাজটি শেষ হবার পর মনে হচ্ছে, একটি ছোট ভূমিকা ছাড়া লেখাটি অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে।

আমাদের তিনজনের পরিচয় প্রায় চৌদ্দ বছর আগে, ২০১১ সালে, ব্লগে লেখালেখির সূত্রে। আশ্চর্য হলেও সত্য যে আমরা যখন এই লেখায় হাত দিয়েছিলাম তখন একজন আরেকজনের ব্লগনেম ছাড়া আসল নামও ঠিকঠাক মতো জানতাম না। লেখা আসলে লেখকের ভাবনার প্রতিচ্ছবি—এই সূত্রে বিশ্বাস করে ধরেই নিয়েছিলাম যে কারও সাথে কারও মনোমালিন্য হবে না। বাস্তবে হয়েছিলও তাই।

প্রায় তিন মাসব্যাপি লেখা এই গল্পে আমাদের আলোচনা হয়েছে বিস্তর, তর্ক হয়নি একবারও।

ঠোকাঠুকি না হবার আরেকটি কারণ হচ্ছে আমাদের তিনজনের তিন ঘরানার লেখা। সামারা তিন্নি–ব্লগনেম: ত্রিনিত্রি; নদীর উৎস থেকে শুরু করে বহমান জলের মতো দীর্ঘ উপন্যাস জাতীয় লেখা লিখতে পছন্দ করেন। হাফিজুর রহমান রিক–ব্লগনেম: রিয়েল ডেমোন; লেখেন আতশবাজির মতো। ঝড়ের গতিতে আসবে এবং যাবে কিন্তু রেখে যাবে অসাধারণ অনুভূতির রেশ। কৃষ্ণ কুমার গুপ্ত–ব্লগনেম: নীরব০০৯; একজন খাঁটি কবি; তার কথায় কাব্য, লেখায় কাব্য এবং তার জীবন যাপনের ধরণেও শব্দমালা একাকী দুপুরে বাড়ির উঠোনের আতা গাছটির নিচে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এই বইয়ের চরিত্র নীরব-এর লেখা সকল কবিতা তারই রচনা। তার রচিত 'মেঘ বৃষ্টি প্রেম' কবিতাটি মাথায় রেখেই আমরা এই গল্পে স্বতঃস্ফূর্ততা এনেছি।

আমাদের এই গল্পে আমরা বেছে নিয়েছি আমাদের চারপাশে থাকা অন্য সবার মতোই সাধারণ তিনটি ছেলে মেয়ের চরিত্র। যাদের সবাই চেনে কিন্তু আবার কেউই চেনে না। নুশেরার চরিত্রটি লিখেছেন সামারা তিন্নি, রিকের চরিত্রটি লিখেছেন হাফিজুর রহমান রিক আর নীরব চরিত্রটি লিখেছেন কৃষ্ণ কুমার গুপ্ত।

লেখাটি কেন আমাদের তিনজনের এত পছন্দ, সেটি বুঝতে আমাদের নিজেদের জীবনে অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। ভূমিকা লিখতে গিয়ে আমরা বুঝতে পারছি মনের অজান্তেই সম্ভবত আমরা নিজেদের চরিত্রের খানিকটা করে অংশ আমাদের গল্পের চরিত্রগুলোকে ধার দিয়েছি। তবে তাই বলে আশা করি পাঠক ভেবে বসবেন না যে এটা আত্মজৈবনিক কোনো লেখা। এই লেখার সকল চরিত্র এবং ঘটনা কাল্পনিক এবং কারও সাথে মিলে গেলে তা অনভিপ্রেত কাকতাল মাত্র।

লেখাটি যখন আমরা লিখেছিলাম তখন আমরা তিনজনেই নিজস্ব জীবন নিয়ে ব্যস্ত সময়ে ছিলাম। মাথায় আসা প্লটগুলো যেন ফুড়ুৎ করে

উড়ে না যায়, তাই সেগুলোকে আমরা আটকে রেখেছিলাম অ্যাপ্রনের পকেটে রাখা ছোট নোটবুকে, ক্লাসের লেকচারের মাঝে কিংবা মেসেঞ্জারের সাদা স্ক্রিনে। এই ছিল যেন আমাদের ব্যস্ত জীবনে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেবার একটি ছোট্ট স্থান।

গল্প শুরুর পেছনে যেমন গল্প থাকে, তেমনি থাকে কিছু মানুষের অবদান যাদের কথা না বললেই নয়। আমাদের তিনজনকে একই ছাতার নিচে নিয়ে এসেছেন ব্লগার কামরুল হাসান শাহী ভাই। এমনকি তিনজন মিলে যৌথ গল্প লেখার আইডিয়াটাও উনার। লেখা চলাকালীন সময়ে প্রতিদিন লেখার অগ্রগতি নিয়ে খোঁজ করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। আজকে তাকে কৃতজ্ঞতার সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের তিনজনকে একটি চমৎকার অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত করার জন্য।

অসংখ্য ধন্যবাদ কফিশপের পাঠকদের, যাদের কারণে এই বই আজ দিনের আলো দেখছে। তাদের উৎসাহে আমরা মাঝে মাঝে চিন্তায় পড়ে যাচ্ছিলাম যে আসলেই এগুলো কাল্পনিক চরিত্র নাকি রক্ত মাংসের মানুষ! তাদের সেই স্মৃতিগুলোকে আরেকবার জীবন্ত করে দিতেই আমাদের এই প্রয়াস।

কফিশপ উপন্যাসটি ছুঁয়ে দেখা আমাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল। ছাপার অক্ষরে উপন্যাসটি আবার আপনাদের মন জয় করবে বলে আশা করি। আশা করি কফিশপ পাঠককে শতভাগ তৃপ্তি দিবে। দীর্ঘকাল যার রেশ থেকে যাবে পাঠকের মনে। আর তবেই সার্থক হবে আমাদের তিনজনের অক্লান্ত পরিশ্রম। সময়টা হোক কফিশপ-এর।

– লেখকত্রয়ী

১৯০
শব্দ

প্রথম অনুচ্ছেদ

রিকের কথা: ছন্নছাড়া জীবনে নুশেরা

আধাঘণ্টা হয়ে গেল সায়েন্সল্যাব মোড়েই আটকে আছি। এমনভাবে আটকে গেছি যে বাইক নিয়ে ফাঁকফোকর খুঁজে বের হবার উপায় নেই। সামনে একটা রিকশা, দুই পাশে দুটি প্ল্যাস্টিক; মানে প্রাইভেট কার। পেছনে একটা বাস। আপাতত সামনের রিকশাটার কোনো ব্যবস্থা করা গেলে এই জ্যাম ঠেলে বের হওয়া যাবে। আজকাল ফুটপাতে বাইক নিয়ে উঠতে ভয় করে। মানুষজন সচেতন হয়েছে। ফুটপাতে বাইক নিয়ে উঠলে বাংলার শেষ নবাবের বংশধর আখ্যা দিয়ে রীতিমতো অপমান করে।

ঢাকা শহরে এই ট্রাফিক জ্যাম একটা বিকট সমস্যা। এর জন্য কত শত প্রেম যে ব্রেকআপে বিবর্তিত হয়েছে তা একটা জরিপ করলে এই সংখ্যাটা নেহায়েত কম হবে না। মাঝে মাঝে বিরক্তি লাগে লাল সবুজ বাতির ট্রাফিক সিগন্যালটা দেখলে। সবুজ বাতি জ্বলছে অথচ যানবাহন সব স্থির আটকে আছে। আবার লাল বাতি জ্বলছে তো দাও যে যার মতো ছুট। কেউ ভ্রুক্ষেপই করে না ট্রাফিক লাইটের দিকে।

ডানদিকের কালো প্রাইভেট গাড়িতে একটা আদুরে চেহারার মেয়ে বসে আছে। বড়লোকের মেয়েরা সুন্দরী হয়। এরা অস্বচ্ছলতায় বড় হয় না, খাবারে থাকে পর্যাপ্ত প্রোটিন। হয়তো একারণেই দেখতে কিউট হয়। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। এই যেমন আমাদের ক্লাসের নীনা। বিরাট বড়লোকের মেয়ে, কিন্তু নাকটা একেবারে থ্যাবড়ানো। গাড়ির এই মেয়েটা মাশাল্লাহ সুন্দরীর কাতারে আছে।

আচ্ছা, আপনি কি সুন্দরের অর্থ জানেন? আমি অবশ্য সুন্দরের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছি। সুন্দর মানে কিন্তু কালো বা ফর্সার দ্বন্দ্ব না। যেমন নিখুঁত নাক চোখ চুল এবং স্বাস্থ্যের মোহনীয়তায় একটি কালো বর্ণের মেয়েও সুন্দরী হতে পারে। আবার নিখুঁত না হওয়াতে ফর্সা একটি মেয়েও সুন্দর হতে পারে না।

শুনিয়ে তার পাশের বান্ধবীকে বলল, "দেখছিস, লোকটার প্যান্টের চেইন খোলা।"

শুনে আমি তো ঘেমে নেয়ে একাকার। তবে কি এতটা রাস্তা দারোয়ান গেইট খুলেই পাহারা দিয়েছে! দারোয়ানটারও না কোনো আক্কেল জ্ঞান নেই। খোলা দরজা দিয়ে বাতাস ঢুকছে টেরও পায়নি। আমি বাম পাশে একটা সরু গলি দেখে ঢুকে পড়ি। এদিক ওদিক তাকিয়ে প্যান্টের চেইনটা লাগাতে যেয়ে দেখি একি! চেইন তো লাগানোই আছে। মেয়েটা তাহলে আমাকে বোকা বানালো! আমি অবশ্য এই মুহূর্তেও ঘামছি। তা পাশের গাড়িতে বসে থাকা মেয়েটির কথায় নয়। প্রচণ্ড গরমে ঘেমে নেয়ে একাকার অবস্থা।

ওহ নুশা!

ইদানিং আমার কী হয়েছে আমি ঠিক জানি না। প্রেম ভালোবাসার কথা মনে হলেই নুশেরার মুখ ভেসে উঠে। আচ্ছা, আমি কি নুশেরাকে ভালোবাসি? আমার মনে এই প্রশ্নটা প্রায়ই আসে। কিন্তু মন ছাড়াও মানুষের ব্রেইন বলে তো আরেকটা জিনিস আছে। আমি অবশ্য আমার ব্রেইনের বিরাট ভক্ত। আমার ব্রেইন এই প্রশ্নের উত্তরে বলে, "বাবা রিক! এসব কী? এসব প্রেম ভালোবাসা তোমার সাথে যায় না, বোকা ছেলে। তুমি কি জেনে শুনে বলির পাঠা হতে চাও? স্থির হও বৎস! কী আজব! তুমি এসব ভাবলে কী করে হবে বলো?"

ধুর ব্যাটা ব্রেইন আপাতত দূরে গিয়া মর। নুশাকে বলেছিলাম ক্যাফে বারিস্তায় আসতে। মেয়েটা অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করে আছে মনে হয়। আদ্রিতাকে ভার্সিটি থেকে ওর বাসায় ড্রপ করে আসতে যেয়ে এত বিড়ম্বনা। আদ্রিতা আমার ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ড, ব্যাচমেট। প্রায় প্রতিদিন গায়ের উপরে এসে বলে, "রিক আমাকে একটু ড্রপ করে দাও না, প্লিজ! প্লিজ! প্লিজ!"

আদর্শ পুরুষের উদাহরণ হয়ে আমি নারীদের আবদার কীভাবে ফেলি বলুন? আজব নারী জাতি! আবদার করার সময় জ্ঞান নেই। এখন ওর আবদারের ঠেলাটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

ওহ নুশা! এই মেয়েটা কি আমাকে শান্তিতে একটু থাকতে দেবে না! সারাদিন মাথায় ঘুরপাক খায়। ব্যাপক যন্ত্রণায় আছি এই সম্পর্কের উর্ধ্বে থাকা মেয়েটিকে নিয়ে। সম্পূর্ণ একটা রাত ছাদের বড় পানির ট্যাংকিটার উপরে শুয়ে ভেবেছি, এই মেয়ের সাথে আমার সম্পর্কটা আসলে কী? প্রথমে ভাবলাম বন্ধু, কিন্তু ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব হলো কবে সেটাই খুঁজে পেলাম না। পরে ভাবলাম ভালোবাসার একটা সম্পর্ক হতে পারে। কিন্তু কীসের প্রেম-ভালোবাসা? আমাদের মাঝে এমন কোনো স্বীকৃত রিলেশন নেই। লাস্ট ভাবলাম স্যোলমেট হতে পারে, নাহ এটাও না। মাত্র দুই বছর হলো এই মেয়ের সাথে পরিচয়, কীভাবে আমার স্যোলমেট হয়! তাছাড়া আমি ওর মাইন্ড রিড করতে পারি না আর টেলিপ্যাথির মাধ্যমে আমি জানতেও পারি না সে কী করছে। সুতরাং ও আমার স্যোলমেটও না।

পুরা একটা রাত জেগে শেষে কোনো ডিসিশনেই আসতে পারলাম না। নুশা মানে নুশেরা নামের এই মেয়েটার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় ফেসবুকে। তারপর মেসেঞ্জারে নিয়মিত বার্তা চালাচালি। আঁতেল টাইপ মেয়ে। মেডিকেল স্টুডেন্ট। প্রথম দিকে ইউরোলজি অথবা কার্ডিয়াক সার্জারি নিয়ে বকবক করে মাথা নষ্ট করে দিত। ধীরে ধীরে বুঝলাম এই মেয়ের মাঝে খুব সুন্দর একটা মন আছে। একদিন নিজ থেকেই বলে ফেললাম, "নুশা, লেটস মিট..."

আমি ভেবেছিলাম এই মেয়ে দেখা করার কথায় ভয় পেয়ে যাবে। কিন্তু না, আমাকে অবাক করে দিয়ে অফার একসেপ্ট করে নিলো! কী আর করার, ডেট ফিক্সড ক্যাফে বারিস্তায়। সেই থেকে এই কফিশপটা আমাদের নিয়মিত দেখা করার স্থান হয়ে গেল।

ছিমছাম এই ক্যাফের সব থেকে আকর্ষনীয় প্লেস হলো স্মোকিং জোনটা। সেই দিকটা আমাকে সারাক্ষণ টানলেও পাশে থাকা মেডিকেলের একটা মেয়ের সামনে সেখানে যেয়ে ধোঁয়া উড়ালে যে কী পরিমাণ বয়ান শুনতে হবে, সেই চিন্তা করে আর যাওয়া হয় না। যদিও এই মেডিকেল পড়ুয়া আঁতেল মেয়েটাকে বিরক্ত করতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। সেজন্য আজকে ফোন বন্ধ করে রেখেছি যাতে ফোন দিতে দিতে অধৈর্য হয়ে যায়। যেয়ে দেখব নুশা অধৈর্য হয়ে আছে। রাগে টমেটোর মতো লাল হয়ে আছে। এই রাগকে আমি পানি করব। এটাই আমার খেলা। আমি এই খেলায় ঝালিয়ে নেই নিজেকে প্রতিনিয়ত। নিজেকে পাকা খেলোয়াড় বলে নিজেই বাহবা দেই। আমি হচ্ছি রাগমিস্ত্রি, সকল প্রকার রাগের মেরামত করতে জানি।

প্রথম যেদিন নুশার সাথে দেখা করতে যাই, সেদিনও অনেক দেরি করে গিয়েছিলাম। আসলে টাইম নিয়ে তেমন মাথাব্যথা আমার কোনো কালেই ছিল না। আজরাঈল আঙ্কেল তো আর বলে কয়ে আসবে না। সুতরাং এসব ক্যালকুলেশনে সময় দিয়ে সময় নষ্ট করা আমার নীতির বাইরে। যাই হোক, সেদিন কফিশপের পাশে বাইক পার্ক করে ঢুকতে যেয়ে হাতঘড়িতে দেখলাম প্রায় ৪০ মিনিট দেরি করে এসেছি। মেয়েটা চলে গেছে হয়তো। দরজার কাছে যেতেই মেয়েলি একটা কণ্ঠ থেকে শুনলাম, "এসেছ তাহলে?"

তাকিয়ে দেখলাম ছিমছাম সুন্দরী একটা মেয়ে। ফ্যাকাশে দে গায়ের রং। ব্ল্যাক ড্রেসের সাথে ম্যাচ করিয়ে কালো টিপ আর চোখে কাজল। মেয়েরা চোখে কাজল দিলে তাদের সৌন্দর্য কয়েক'শ গুন বেড়ে যায়। আমার জানা মতে মেডিকেল স্টুডেন্ট হিসেবে এই মেয়ের চোখে ব্রিলিয়ান্ট ভাবধারী একটা মোটা ফ্রেমের চশমা থাকার কথা ছিল। কিন্তু মেয়েটা একটু ডিফ্রেন্ট। একটু না অনেকখানি। কোনো ছেলের সাথে সরাসরি আই কন্ট্যাক্ট করে খুব কম মেয়েই কথা বলে, এই মেয়েটির সেই সাহস আছে। কিছুটা অবাক হলেও কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব